উলঙ্গিনীর গাঁথা

শমীক ঘোষ

সাধু লালী, লাল, লাল্লা, লাল্লা আরিফা, লাল্লেশ্বরী, লাল দেদ বা লাল দিদার জন্ম চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয় দশকে (আনুমানিক ১৩২০ খ্রীষ্টাব্দ) কাশ্মীরের সেম্পোর গ্রামে (মতান্তরে পদ্রেনথন, শ্রীনগরের ৪ মাইল দক্ষিন-পশ্চিমে)। তখন মসনদে সুলতান আলাউদ্দিন। ১২ বছর বয়সে বিবাহ নিকটবর্তী পাম্পোর গ্রামে এবং ২৪ বছরে গৃহত্যাগ। প্রথমে গুরুর আশ্রম। পরে পথে পথে, বনে বাদাড়ে একাকী যাত্রা। অন্তর আসল ও বাহির নকল এই বোধে কখনও উলঙ্গ, বস্ত্রহীনা। রচনা করেছেন ১৮৪ টি বাখ (বাক্য) বা কথা যা আজও কাশ্মীরে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এর মধ্যে ১০৯ টি উদ্ধার করেন স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন এবং ৭৫ টি পন্ডিত আনন্দ কাউল। অন্তরের অন্তরতম উপলব্ধির সন্ধানে তাঁর গানে মিশে গেছে শৈব, বৌদ্ধ, সুফি দর্শনের গভীর চিন্তা। দৃঢ় ভাবে দাঁড়িয়েছেন সংকীর্ণ আচার বিচারের বিরুদ্ধে। জীবনের শেষ ভাগে সাক্ষাৎ ঘটেছে ফকির জনক বিখ্যাত ঋষি শেখ নাসির-উদ-দিন ও মির সৈয়দ আলি হামাদানির সাথে। দূর্ভাগ্যজনকভাবে হয়ত মহিলা বলেই লিখিত ইতিহাসের পাতায় প্রকৃত স্থান পেতে দুশো বছর সময় লাগে। কিন্তু ভারতবর্ষের মূল ইতিহাস তো মুখে মুখে বহমান। তাই সাধু লালীর গান লোকমুখে বাহিত হয়ে এসেছে ৭০০ বছর। এখানে গ্রিয়ারসন সাহেব এক সুন্দর কথা বলেছেন। পাশ্চাত্য ধাঁচে যারা ভাবেন লিখিত সাহিত্যই অধিক প্রামানিক, তাদের জন্য। যে কথা উনি সংগ্রহ করেন, অনেক দিন পর কাশ্মীরে ফিরে অন্য এক পন্ডিতকে বলতে বলেন এবং শোনেন একটা শব্দও আলাদা নয়। এটাই ভারতবর্ষের বিশেষত্ব। এভাবেই বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত অতিবাহিত হয়ে এসেছে।

সব সাধু, সন্ত, ফকিরদের নিয়ে যেমন নানান অলৌকিক গল্প প্রচলিত থাকে, সাধু লালীও তার ব্যতিক্রম নন। তাঁর সংসার জীবন সুখের ছিল না। শাশুড়ি নাম দিয়েছিলেন পদ্মাবতী, কিন্তু খুবই অত্যাচার করতেন। তাঁর থালায় ভাত কম দেবার জন্যে শাশুড়ী থালায় একটা বড় পাথর দিয়ে ভাত দিয়ে ডাকা দিতেন যাতে লোকে ভাবে অনেক ভাত দেওয়া হচ্ছে। খুব ভোরে নদী থেকে জল আনতে যেতেন সাধু লালী। প্রায়সই ফিরতে দেরী হত কারণ তিনি নদী পার হয়ে এক নিরালা স্থানে কিছুক্ষণ ধ্যান করতেন। শাশুড়ি বরকে উসকানোয় বরের সন্দেহ হয় সাধু লালীর প্রতি। সেই সন্দেহের বশে একদিন সাধু লালী বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে বাঁশ দিয়ে মাটির কলসীতে আঘাত করে বর। কথিত আছে, কলসীটি ফেটে যায়, কিন্তু জল অবিকৃত থাকে। সেই জল তিনি উঠানের এক পাশে ঢেলে দিয়ে গৃহত্যাগ করেন। সেখানে একটি পুকুর তৈরী হয় যা লালের পুকুর নামে দীর্ঘদিন পরিচিত ছিল। এখন আর জল নেই।

সাধু লালী যখন উলঙ্গ হয়ে ঘুরতেন, তিনি মনে করতেন চারপাশে কোনও পুরুষ নেই। কিন্তু একদিন গুরুকে দেখে তিনি গাছের আড়ালে লুকান, বলেন উনি পুরুষ। সেই গুরু একদিন নদীতে স্নান করছেন। দেখছেন সাধু লালী একটা কলসীর বাইরেটা খুব ঘসে ঘসে যত্ন করে মাজছেন কিন্তু তার ভিতরে অনেক কাদা। গুরু হেসে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি ওই কাদাভরা কলসীটা এত যত্ন করে মাজছ কেন? সাধু লালী পাল্টা প্রশ্ন করেন, আপনি রোজ স্নান করেন কেন? গুরু অত্যন্ত চমৎকৃত হন এবং ৪০ দিন উপবাস ও তপস্যা করেন আত্মশুদ্ধির জন্য।

ইতিমধ্যে সাধু লালী একদিন আসেন গুরুর দর্শনে। তাঁকে বলা হয়, গুরু তপস্যা করছেন। তিনি শুনে হেসে বলেন, "হ্যাঁ, নন্দ মার্গে ঘোড়াকে নুন খাওয়াচ্ছেন।" আসলে গুরু আড় চোখে দেখছিলেন নন্দ মার্গে চরার সময় তাঁর ঘোড়াকে কেউ পদাঘাত করছিল। সাধু লালী সেটা দেখে ফেলেন। যাই হোক, এই মন্তব্যে গুরু অপমানিত বোধ করেন। এরপর সাধু লালী তাঁকে প্রকৃত তপস্যা দেখান। পূর্ণিমা রাত্রে তিনি একটি মাটির কলসী মাথায় ও আর একটি পায়ের নীচে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। ধীরে ধীরে অনাহারে শীর্ণ হয়ে পড়েন। পক্ষকাল বাদে অমাবস্যায় দেহের আর কিছুই পড়ে থাকেনা, কলসীতে চকচকে এক পারদের টুকরো ছাড়া। কিন্তু চন্দ্রকলার সাথে ধীরে ধীরে তিনি আবার প্রকট হন এবং পরবর্তী পূর্ণিমাতে নিজ দেহে ফিরে আসেন। গুরু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "ওই পারদের টুকরোটা কি ছিল?" সাধু লালী উত্তর দেন, "ওটা আমিই ছিলাম, আমার আত্মা, আমার বাসনা, আমার মন, আমার অহং।" এই গল্পই আবার খুঁজে পাওয়া যায় পীর গুলাম হোসেনের কথায় যেখানে গুরু ছিলেন মুসলিম। আসলে সাধু লালীর তিরোধানের পর ঋষি শেখ নাসির-উদ-দিনের শিষ্য নন্দ ঋষি সাধু লালীর বাখ্যানে আকৃষ্ট হন এবং ওই ঢঙে আরও কিছু লেখা লেখেন। কথিত নন্দ ঋষি প্রথমে মায়ের দুধ খেতে অস্বীকার করেন, কিন্তু সাধু লালী তাঁর পিঠে চাপড় মেরে দুধ খেতে শেখান। হিন্দু ধর্মের কট্টরপন্থীদের দ্বারা ব্রাত্য হবার পরবর্তী কালে কিছু ফকিরের দল তাঁকে মুসলিম ধর্ম গ্রহনকারী বলতে চান ও লাল্লা আরিফা নাম দেন। কিন্তু আসলে তিনি প্রতিষ্ঠিত কোনো ধর্মেরই ছিলেন না। নিজেকে জানা, নিজের অন্তরে অন্তরতম আত্মার অনুসন্ধানেই তিনি তাঁর সাধক জীবন অতিবাহিত করেছেন।

তাঁর জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ নিয়েও নানান কাহিনী। পূর্বজন্মে তাঁর একটি পুত্র সন্তান হয়। কিন্তু সেই সন্তানকে তিনি বুকের দুধ খাওচ্ছিলেন না। কারণ হিসাবে তিনি পারিবারিক পুরোহিত শ্রী সিদ্ধ শ্রীকান্তকে বলেন। এ আমার সন্তান নয়। আমি কিছুদিনের মধ্যেই ঘোড়া হয়ে অমুক গ্রামে জন্মাব আর আমার এই এই চিহ্ন থাকবে। আপনি যদি দেখতে চান, তাহলে এক বছর পরে ওই গ্রামে আসুন। এক বছর পরে সেই গ্রামে তিনি সেই ঘোড়ার ছানা দেখতে পান। কিন্তু সে তখন বলে, ছয় মাস পরে আমি অন্য এক গ্রামে কুকুর হয়ে জন্মাব। বলতে না বলতে পাশের ঝোপ থেকে একটা বাঘ এসে তাকে খেয়ে নেয়। ছয় মাস পরে সেই গ্রামে গিয়ে তিনি কুকুরছানাটির সন্ধান পান। এভাবে ছয়টি জন্মের পরে তিনি আবার মানুষ জন্ম নেন সাধু লালী হয়ে। ১২ বছর বয়সে তাঁর বিয়ের

সময় তিনি শ্রীকান্তকে জানান, তাঁর বর হচ্ছে সেই ছেলেটি যাকে তিনি সে জন্মে দুধ খাওয়াতে অস্বীকার করেছিলেন।

সাধু লালী যখন উলঙ্গ হয়ে ভিড়ের মধ্যে গান গাইছেন, শ্বশুর রেগে টেনে ঘরে নিয়ে আসেন। প্রশ্ন করেন, "এমন আচরণের মানে কি?" সাধু লালী বলেন, "ওখানে কোনো মানুষ ছিল না, সব ভেড়া।" অবাক হয়ে শ্বশুর জানলা দিয়ে দেখেন ওই জমায়েতে কোনো মানুষ নেই, শুধু ভেড়া। একদল লাল্লাকে পাগল নেংটি বলত আর একদল যারা সম্মান করত। একদিন সাধু লালী দুটো সমান লম্বা কাপড় দুই কাঁধে নিয়ে বস্ত্রহীনা বেরোলেন। কেউ সম্মান করলে একটাতে গিঁট দিলেন, অপমানে অন্যটায়, বাড়ি ফিরে দেখালেন, দুটোতেই গিঁটের সংখ্যা সমান।

তৈমুরলঙের অত্যাচারে তখন সাধুরা পলাতক। ফরমান জারী হয়েছে, সেই সাধুই প্রকৃত সাধু, যিনি জ্বলন্ত আগুন লাল ঘোড়ায় চড়ে বসতে পারবেন। মির সৈয়দ আলি হামাদানি সেই সময় ঘুরতে ঘুরতে কাশ্মীর আসেন। সাধু লালী উলঙ্গ বসেছিলেন রাস্তার ধারে। হামাদানিকে দেখে পুরুষ এসেছে, পুরুষ এসেছে বলে তিনি এক রুটির কারখানায় ঢুকে পড়েন আর হামাদানিকে সে দিকেই আসতে দেখে গরম উনুনে ঝাঁপ দেন। ফিরে আসেন পরী হয়ে। এরপর হামাদানির সাথে তিনি চার ভুবন (মানব লোক, দেবদূত লোক, সর্বশক্তি লোক, ঈশ্বর লোক) পরিক্রমা করে তাঁকে উর্ধ্বতন স্বর্গ অগ্নিলোক, আর্শ-ই মাজিদে নিয়ে যান।

সুলতান আলাউদ্দিনের বড় ছেলে আরও তিন সঙ্গী সহ সাধু লালীর কাছে আসেন। তিনি একটা পাত্রেই তাদের শরবত দেন। শেষ জন পায় না। সাধু লালী বলেন প্রথম জন বড় রাজা হবেন, দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী, তৃতীয় সেনাপতি। চতুর্থ জন ফেরার পথে মারা যান। বাকি কথা ফলে যায়।

শ্রীনগরের ২৮ মাইল দক্ষিন-পশ্চিমে ভেজিব্রোর গ্রামের জামা মসজিদের ধারে সাধু লালীর তিরোধান হয়। এক বিরাট লাল মাটির পাত্রে তিনি প্রবেশ করেন আর একটি পাত্র দিয়ে ঢেকে দেন। রাত্রে এক উজ্জ্বল আলোর স্তম্ভ সেখান থেকে নির্গত হয়ে আকাশে মিলিয়ে যায়। সকালে পাত্র খুলে কিছুই পাওয়া যায় না। সময়কাল আনুমানিক ১৩৭২ সাল, সুলতান সিহাব-উদ-দিনের রাজত্বকালে। কাহিনী যেভাবেই রচিত হোক, আশ্চর্যের কথা, সাধু লালীর কোনো সমাধি বা গোরস্থান নেই।

আগেই বলেছি, সাধু লালী কোনো প্রতিষ্ঠিত ধর্ম প্রচারক ছিলেন না। সব ধর্মেরই সারাৎসার তিনি আত্মস্থ করেছিলেন। তাঁর ধর্ম ছিল নিজেকে জানা। অন্তরের অন্তরতম সার সত্য জ্ঞানই যার পরম লক্ষ্য। যতদিন তা জানা না যাবে ততবার জন্মাতে হবে। ততদিন যেন এই জন্ম মৃত্যুর পরিক্রমাই তার কর্ম। সেই জ্ঞানের সন্ধানে জীবন ব্যয়িত করাই তার সাধনা। সেখানে সংসার একটি মোহজাল। মূল লক্ষ্য থেকে সরে গিয়ে মায়ায় জড়িয়ে পড়া। এই

বোধ নিয়েই তাঁর কথা, গাঁথা রচনা। স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন ও ডঃ লিওনেল ডি বার্ণেটের "লাল্লা-বাখ্যানি" প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে। ১৯৩৯ সালে প্রকাশ উর্দু অনুবাদ "বাখ লাল্লা ঈশ্বরী" এ কে ওয়াঙচুর হাত ধরে। পন্ডিত আনন্দ কাউলের "লাল্লা যোগীশ্বরীতে" আমরা খুঁজে পাই আরও নতুন ৭৮ টি বাখ। অধ্যাপক জয়ালাল কাউলের অনন্য গবেষনা গ্রন্থ, "লাল দেদ" প্রকাশ করে সাহিত্য আকাদেমী ১৯৭৩ সালে। এই বইটি সাধু লালীর জীবনী ও রচনা সম্বন্ধে আমাদের প্রায় সম্পূর্ণ জ্ঞানে সম্মৃদ্ধ করে। বর্তমান লেখায় উল্লিখিত সংখ্যাগুলি এই পুস্তক অনুসারে। সাধু লালীর বাখ অনুদিত হয়েছে সংস্কৃত, উর্দু, ইংরাজী, হিন্দি ভাষায় (হয়ত আরও, সবতো আমি খবর জানিনা)। অতি সম্প্রতি, শ্রীমতী নবনীতা দেবসেন একটি দৈনিক পত্রিকায় কয়েকটি বাখের বাংলা অনুবাদ কবিতা আকারে উপহার দেন।

সাধু লালীর বাখ আমি প্রথম পড়ি কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত বিদ্যালয়ের নবম শ্রেনীর হিন্দি পুস্তকে। পড়ে অবাক হয়ে যাই, যে লালনেরও ৫০০ বছর আগে এই গান গাওয়া হয়েছে। তারপর যত তাঁর জীবন জেনেছি, মনের মধ্যে একটাই ছবি ফুটে উঠেছে, এক সাধিকা, ঘর ছেড়ে, বিলাস ব্যসন দূরে থাক, কখনও বস্ত্র ছেড়ে বনে বাদাড়ে, পথে পথে এই গভীর ভাবের গান গেয়ে চলেছেন। এই দৃশ্যকে আমি কখনই তাঁর কথার থেকে আলাদা করতে পারিনি। তাই তাঁর কথা আমার কাছে গান হয়েই এসেছে। এই বাংলার মাটিতে তা যেন চলমান সাধক বাউল ফকিরদের উচ্চারণ। অনেক কবিতা লিখেছি, কখনও গান লিখিনি। সব সময় ভেবেছি, গান লেখা খুব কঠিন। সাধু লালীর বাখ আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে গান রচনার। তাই আক্ষরিক অনুবাদ বা ভাবানুবাদ আমি করিনি। বরং তাঁর ভাব স্মরণে বাংলায় গান লিখেছি। আমি গায়ক নই। হলে বড় ভাল লাগত। হয়ত সময় পেলেই পথে পথে গানগুলি গেয়ে বেড়াতাম। গুনীজন গানগুলোয় সুর দিলে বড় আনন্দ পাব। যা হোক অনেক আলোচনা হল, এবার গান হোক।

কথা ১

কাঁচা সুতোয় টান পড়েছে
সুতো বাঁধা আমার নায়ে
আমি কেমন করে ভবসাগর
করব ওপার পায়ে পায়ে।

কাঁচা কলসে ভরলাম নদী
তেষ্টায় পাব পানি
বুকের কলস ফাটছে যে রাত
কেবল কাদা ছানি।

কাঁচা সাঁকোয় জল উছলি
মন উছলি ঘরের টানে
কাজের ফাঁকে রয় যে ফাঁকি
উঠোনে তাঁর যাই কেমনে।

কথা ২

আমি দোরে দোরে কেঁদে ফিরি
যার সন্ধানে ঘর ছেড়ে
সে জন কেমন করে ফেলল নোঙর
ভবের সংসারে।

যারে কর্মে খুঁজি, ধর্মে খুঁজি
খুঁজি সাধুর অন্তরে
সে মন কেমন করে পড়ল বাঁধা
নিত্য পিঞ্জরে।

বসত বেড়া, পথের ধুলা
লাভের কড়ি, সোহাগ জ্বালা
কার ছায়া তার পড়বে ঘাটে
আসবে যখন যাবার বেলা।

আনমনে সে ভুলল পথে
আত্মবন্ধুরে।

কথা ৪

কাঁচা কাঠের ছিলা কাঁধে
পাতলা ঘাসের শর
কারিগরির কাঁচা হাতে
বাঁধতে হবে ঘর।

মন আমার হাটের মাঝে
করছে দোকানদারী
দেহ ধুতে সাত নদীতে
তীর্থে দিলাম পাড়ি।

দয়াল, আমার ভাগ্যে আছে
কি দুর্দৈব যার
কুল কিনারা পাইনা খুঁজে
কে পার কে অপার।

কথা ৭

কোথায় পাবি বসতবাড়ি
কোথায় পাবি ঘর
ত্রিকাল নদীর নাইয়া রে তোর
মিলবে কোথায় চর।

চিরকালের কূলে ফেরা
চিরকালের পাড়ি
অহর্নিশি যাত্রা যে তোর
কি হবি সংসারী।

যাওয়ার জন্য ফিরে আসা
ফেরার জন্য যাওয়া
নাইয়া রে তোর
জনম, মরণ সবই গোলকধাঁধা।

শূন্য থেকে শূন্যে আরও
আঁধার ঘুচে আঁধার
ভ্রমণকালে কিছুই কি তোর
মিলল না রে পাবার।

জানিস মিছে, বুঝিস কি সে
খুঁজিস মরে চর
(তোর) গেল না মন সন্ধানে যার
রহস্য অপার।

কথা ৮

কোথা হতে আইলাম আমি
যামু রে কোন থানে
কোন তরঙ্গে বাইলাম নদী
বাইয়া যাইমু কনে।

দয়াল, বাইয়া যাইমু কনে।

পারান আমার শ্যাষ হবে কি
পামু দ্যাখা তাঁরে
কোন খেলাডা খ্যালছেন বইসা
ভব নদীর পারে।

দয়াল, ভব নদীর পারে।

বুকের খাঁচা যায় শুকায়ে
শূন্য বাতাস টানি
লইয়া চল যেই সাগরে
গহীন রসের পানি

দয়াল, গহীন রসের পানি।

কথা ১৪

কার সাথে ঘর পাতাইলা বন্ধু
পিরিত কর কারে
অকুল সাগর যাইবার ছিল
বাইন্ধা গেলা চরে।

ফাঁকির সে ধন আপন হল
রতন পাইলা না
তিন ভুবনে ঘুইরা আইলা
সুজন চিনলা না।

জীবন মরণ গড়ায় চাকা
নিত্য জোয়ার, নিত্য ভাটা
মাঝখানে মন ফান্দে পইড়া
রইলা বসে পাড়ে।

অকুল সাগর যাইবার ছিল
বাইন্ধা গেলা চরে।

কথা ১৬

ভরবে না তোর মাঠের ফসল
যে বীজ গেলি বুনে
জুড়বে না তোর মরা খাঁচা
যতই বাঁধিস টেনে।

দেহখানা বাঁধতে গেলে
অচিন যৈবন জানতে লাগে
যেমন চাষা ফলায় ফসল
মাটির গন্ধ চিনে।

বুঝাই কি যে অবুঝেরে
ছুঁড়ছি পাথর হাজত ঘরে
পাইনা রে দুধ খাওয়াইয়া গুড়
যতন করে পাগলা ষাঁড়ে।

কথা ১৭

মায়ের গর্ভে পণ ছিল রাখা
এই শেষ, নয় আর
তবু, জনমের সাধ মিটিল না তোর
ফিরে এলি বারবার।

কুড়ালি যতই মান জগতের
মরণে বাড়িল দাহ
আশা, ভালবাসা, স্মৃতি ও বাসনা
রইল না পড়ে কেহ।

মনের গহনে সাজালি যতনে
পোড়ালে মাটির দেহ।
নিয়ে এলি ভরে, গর্ভের ঘরে
সঞ্চিত মালা তার।

জনমের সাধ মিটিল না তোর
ফিরে এলি বারবার।

কথা ২১

রঙবেরঙের নক্সী কাঁথায়
যত্নে সাজাও ঘরখানা
ঘরের নিচে চোর কুঠুরে
রইল পড়ে ধন অচেনা।

গুরু আমায় মন্ত্র দিলেন একখানা।

বাহির দেহ সাজলে পরে
বুঝবে তুমি কেমন করে
মনের আরো গোপন ঘরে
করছে কারা আনাগোনা।

গুরু আমায় মন্ত্র দিলেন একখানা।

দৃষ্টি যতই অন্তরগামী
আত্মজ্ঞানে ভরবে তুমি
সেই সন্ধানে পাগল লালী
উলঙ্গিনীর গাঁথা বোনা।

গুরু আমায় মন্ত্র দিলেন একখানা।

কথা ২৪

আকারে তাঁর যায় না চেনা
নিরাকার কি তাই অচেনা?
আকারে হয় কত না রূপ
শিব পার্বতী গণেশ স্বরূপ।

নিরাকার সে কেমন হবে
কোথায় গেলে জানতে পাবে?
গুরুর কাছে হাজার বার
প্রশ্ন করাই হল সার।

না জেনে তো সাধ মেটেনা
কিসের শুরু সেই অজানা?

সৃষ্টি মহাবিশ্ব বল
কোন খেলা তাঁর স্বপ্নে ছিল
তিনি কি সেই যোগের যোগী
যাঁর সন্ধানে এ পথ চেনা।

আকারে তাঁর যায় না চেনা
নিরাকার কি তাই অচেনা?

কথা ২৫

না চাইলাম যশ রে দয়াল
চাইলাম না তো কড়ি
কোন সে রসের ভাব তরঙ্গে
বাইয়া গেলাম তরী।

যৌবনকালে কাম অনলে
জ্বলতে আমি গেলাম ভুলে
দিন গুজরান অন্ন জলে
আহ্লাদী সাধ ধুলায় ফেলে
পাগল হইয়া ঘুরি।

অকুল পারে তাঁর সন্ধানে
বাইয়া গেলাম তরী।

দয়াল, বাইয়া গেলাম তরী।

কথা ৫৭

ঠাকুর ঘরে খিল দিয়ে
তোর ঠাকুর সাজার ভান
কোন পুঁথিতে পেলি এমন
মোড়ল হবার জ্ঞান ?

ভাই বোনেদের নাম দিলি তুই
হিন্দু মুসলমান।

খুললে চাবি, মিলবে ছবি
নিজের সাথে নিজের নবী
বললে কথা জানতে পাবি
নিজেই নিজের নাম।

সব জেনে যা হয়নি জানা
আজ নিজেকে জান।